Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Review Article

সেলিম আল দীনের নাটক : বিষয়স্বরূপ

আয়েশা সিদ্দিকা[১]*

[১]বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

*** Corresponding Author:** আয়েশা সিদ্দিকা, ই-মেইল : ayashasiddika.bangla@gmail.com; মোবাইল: +৮৮০১৭১২৫৫০৫৭৭
Received: 23/04/ 2025; Accepted: 29/07/2025; Online Available: 04/08/2025.

১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে একটি দেশ – বাংলাদেশ। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ নানা ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি এ পর্বের নাটকে উপজীব্য হয়েছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, যুবসমাজের হতাশা, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক সংকট। সমাজমনস্ক নাট্যকার সেলিম আল দীনের সৃষ্টিসম্ভারে একাত্তর-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ ও মানুষ উপস্থাপিত হয়েছে গভীর মমতায়। তাঁর নাটকের প্রধান বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যেটাকে, সেটা হলো- সমগ্র বাংলাদেশের বিচিত্র ঘটনা ও সমাজের অবহেলিত মানুষদের সম্পৃক্ততা। পলিমাখা শ্রমজীবী, বুর্জোয়াশ্রেণিসহ ভাবগত ও বস্তুগত সমগ্র বাংলার সামাজিক নিষ্পেষণ, অর্থনৈতিক সংগ্রাম, পেশার রূপান্তর, শোষণের যাঁতাকলে পর্যুদস্ত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার পটোন্মোচিত করেছেন সেলিম আল দীন। "তাঁর রচনায় জীবন সম্পর্কিত গভীর মানবিক বোধের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের স্বরূপ উন্মোচন প্রয়াস আছে [১]।

সেলিম আল দীন পরাধীন পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত আলো-হাওয়ায় তাঁর শিল্পচৈতন্য ব্যাপক বিকশিত হবার সুযোগ পায়। সৃজনশীল প্রতিটি মানুষই তাঁর স্বকালের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। নাট্যকার সেলিম আল দীনও অন্তর্গত ভাবনায় বহন করেছেন একাত্তর-পরবর্তী সময়ের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজের কোনোক্ষেত্রেই বিরাজমান অস্থিরতা নাট্যকার সেলিম আল দীনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। নাট্যকার-জীবনের প্রথম দিকে তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবিত ধারায় নাট্যরচনা শুরু করলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বভূমির হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অঙ্গীকৃত করে তিনি গড়ে তোলেন নিজস্ব নাট্যভুবন। সেলিম আল দীন ১৯৭০ সালে রচনা করেন *অনিকেত অন্বেষণ*। ১৯৭২- এ সমুদ্রভ্রমণের স্বপ্ন নিয়ে লিখলেন *নীল শয়তান : তাহিতি* ইত্যাদি নাটকটি। এর পরের রচনা *সর্প বিষয়ক গল্প* (১৯৭৩) নাটকে দেখা যায় জনৈক রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু। মিলিটারি বাড়ি-বাড়ি সার্চ করছে আর সবাই নেতার ছবি লুকিয়ে ফেলছে। সমান্তরালে শহরে সাপ ঢোকার আরেকটি গল্প পাওয়া যায়। নাগরিক মানুষেরা সেই সাপের ভয়ে তটস্থ। নাটকটির মধ্যে সত্তর দশকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন* নাটকটি ১৯৭২ সালে রচিত একটি বিমূর্ত রীতির নাটক। শহরে জন্ডিস রোগটি মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তাই একদল যুবক শহরে একটি ওষুধের কারখানা স্থাপন করার পক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু সেখানে বেলুন তৈরির কারখানা হচ্ছে। হতাশাগ্রস্থ যুবকেরা সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন প্রত্যাশা করে, কিন্তু পায় না। নাট্যচর্চার এই পর্যায়ে সেলিম আল দীন রচনা করেন *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩)। এই নাটকেও যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এসময় বিশ্বাসঘাতকতা, খুন, গুম মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ে, বেড়ে যায় বেকারত্ব। চাকুরীজীবিরা হয়ে পড়ে দুর্নীতিবাজ, ব্যবসায়ীরা অসাধু। নাচ ও গানের সমন্বয়ে কৌতুকের মাধ্যমে নাট্যকার দর্শকের সামনে বাস্তব পরিস্থিতিটা তুলে ধরেছেন। নাট্যকার ১৯৭৬ সালে *মুনতাসির ফ্যান্টাসি* (১৯৭৪-৭৫) নাটকটি রচনা করেন। পরবর্তীসময়ে লেখক ইংরেজি শব্দ 'ফ্যান্টাসি' বাদ দেন। সেলিম আল দীন অনুধাবন করেছিলেন যে বিশিষ্ট শিল্পপতি মুনতাসিরের অপরিসীম ক্ষুধা কোনো ফ্যান্টাসির বিষয় নয়, বরং সমাজ জীবনের চরম সত্য। অফিসের বড় কর্তা মুনতাসির। তার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ই খাবার। নাটকের শেষে অপারেশন টেবিলে তার মৃত্যু ঘটলে পেট থেকে বের হওয়া সব কিছু জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নাট্যকার বুর্জোয়া শ্রেণির মাত্রাতিরিক্ত লোভ, সবকিছু একাই ভোগ করার মানসিকতা ও লুটপাটের বিষয়টি উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। এরপর তিনি রচনা করেন *করিম বাওয়ালির শত্রু* অথবা *মূল মুখ দেখা*। সুন্দরবনের একটি অংশ সেখানে বাস করে বাওয়ালি সম্প্রদায়। বনকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন-জীবিকা। কিন্তু বন ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম করা অন্যসব অধিবাসীর মতো করিমও চারপাশে অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তি দেখে। পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর ক্রমশ বিলুপ্তিকে উপজীব্য করে বৃহৎ পরিসরে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বর্ণনাত্মক নাট্যাআঙ্গিকে রচনা করেছেন *বনপাংশুল*। তাঁর পরিণত পর্যায়ের অনেক নাটকেই বারবার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির জীবন যাপনের স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে। নিও-এথনিক থিয়েটার হিসেবে *একটি মারমা রূপকথা*-ও (১৯৯৫) সে সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৭৫ সালে রচিত *আতর আলীদের নীলাভ* পাট নাটকেও পাট

© Journal of Gono Bishwabidyalay All Rights Reserved

চাষীদের দুঃখ কষ্টের কথা নাট্যকার আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ১৯৭৭ সালে তিনি *'নাচাও রাস্তা নাচাও'* নাট্যান্দোলনের জন্য *চরকাঁকড়ার ডকুমেন্টারী* নামে একটি পথনাটক রচনা করেন। বাঙালির নিজস্ব নাট্যরীতি অনুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা, তার একটি বড় উদ্যোগ নাট্যকার সেলিম আল দীনের *শকুন্তলা* (১৯৭৭)। মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যানকে কেন্দ্রে রেখে নাট্যকার আধুনিক নাটক *শকুন্তলা* রচনা করেছেন। মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলা চরিত্রটিকে নিয়ে যে একটি পৌরাণিক আবহ সচল আছে, সেলিম আল দীনের শকুন্তলা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শকুন্তলা না স্বর্গের, না পুরোপুরি মর্ত্যের মানব। স্বর্গ-মর্ত্য দুই স্থানেই যে অনাকাঙ্ক্ষিত তার অন্তর্গত যন্ত্রণা পুরাণে অনুপস্থিত হলেও নাট্যকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। পুরাণের ধর্মীয় আবেগ ভেঙে আধুনিক নারীর আত্মপরিচয় সন্ধান ও অস্তিত্বের সংকট স্থাপিত হয়েছে এই নাটকে।

পাশ্চাত্য নাট্যধারার বাইরে বের হয়ে স্বদেশী নাট্যভাবনার সমন্বয়ে বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে আঞ্চলিক ভাষার আশ্রয়ে ১৯৭৮-৮০ কালপর্বে তিনি রচনা করেন *কিত্তনখোলা*। এ নাটক থেকেই বাংলা নাটকে যুক্ত হয়েছে মহাকাব্যিক বিস্তার। এটি মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশ ও যমুনার পূর্ব তীরের কোল ঘেঁসে গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ জনপদের পলিমাখা মানুষদের উপর চলমান শোষণ ও বেঁচে থাকার সংগ্রামে প্রতিবাদী চেতনার কাহিনি। অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশে ঘটনাবহুল দীর্ঘ আয়তনের নাটক *কিত্তনখোলা*। মনাই বয়াতির মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর মেলার আয়োজন করা হয়। সেই মেলাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পশরা নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগম ঘটে। মেলাতে যাত্রা করতে আসে নবযুগ অপেরাদল। লোভী ও ক্রুর ইদু কনটাক্টর দিনমজুর মৃগীরোগী সোনাইয়ের বন্ধক দেয়া চার বিঘা জমি গ্রাস করতে চায়। যাত্রাদলের ছায়ারঞ্জন, নায়িকা বনশ্রীবালার সঙ্গে মেলাতে সোনাইয়ের পরিচয় হয়। বনশ্রী পতিতালয় ছেড়ে একটা সুন্দর জীবন-যাপনের স্বপ্ন নিয়ে যাত্রাদলে এসেছিল। কিন্তু যাত্রাদলের ম্যানেজার সুবল বনশ্রীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের মনোরঞ্জন করতে পাঠায়। এক পর্যায়ে বনশ্রী আত্মহত্যা করে। মৃগী রোগের ওষুধ ভাল্লুকের নখ বিক্রি করে লাউয়ারা। সেই নখ আনতে গিয়ে সোনাইয়ের সঙ্গে ডালিমনের পরিচয় হয়। ভালো লাগায় আবিষ্ট হয় দুজনই। কিন্তু লাউয়ারা গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনায় বিশ্বাসী বলে ডালিমন-সোনাইয়ের ঘর বাঁধা হয় না। ইদু মেলার মধ্যে সোনাইকে জমিটা লিখে দিতে চাপ দেয়। জমিজমার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নিলে ইদুকে হত্যা করে সোনাই। তারপর লাউয়া রুস্তমের সঙ্গে সাপধরা শেখার ইচ্ছা নিয়ে দুখাইপুর চলে যায়।

কিত্তনখোলা নাটকে স্পর্ধিত অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শোষিতের রুখে দাঁড়ানোর সংঘবদ্ধ প্রয়াস লক্ষণীয়। এ নাটকে সোনাই ও যাত্রাদলের সমান্তরালে উঠে এসেছে লাউয়া সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র। এক জীবনে মানুষ যে কত জীবনযাপন করে, তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। জীবন ক্রমাগত রূপ বদল করেই চলেছে। পেশার পরিবর্তন, সঙ্গীর পরিবর্তন, দর্শনের পরিবর্তন অথবা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চরম পরিবর্তন। মেলায় নানা পেশার নানা রঙের মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটে। তাদের প্রত্যেকের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড নতুন বোধের জন্ম দেয়। সোনাই, ডালিমন, রুস্তম, বনশ্রী, রবিদাস, ছায়া, বছির-নামধারী চরিত্রগুলোর চলমান জীবনের নব নব রূপান্তরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণতা পায় *কিত্তনখোলা*। বাংলাদেশের গ্রাম-বাংলার ধর্মের বিভেদ ভুলে গড়ে ওঠা লোকায়ত মেলা, অনেক লোকের সমাগম, মানুষের ক্রুরতা, পেশা বদলে পক্ষেও থাকার প্রচেষ্টা, ভালোবাসা, বিচ্ছেদের হাহাকার, যাত্রাদলের ও ক্ষুদ্র জাতিগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বর্ণনা, গান, পুথি ও সংলাপের সমন্বয়ে নাটকটিতে প্রাণ পেয়েছে। আসলে সেলিম আল দীনের নাটকে জীবন সবসময় সমগ্রতা নিয়ে উপস্থাপিত হয়। নাট্যকার ভাঙাচোরা মানুষগুলোকে প্রকৃতি, সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতির নানা আলোড়নের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেন। এর মধ্যে সমাজের নানা পেশার সম্মেলন যেমন ঘটে, তেমনিভাবে মাছ, পাখি থেকে শুরু করে বিড়াল, গ্রামের মেঠো বা নদীর কূল ছোঁয়া পথ, সমাজপতিদের মুখের কুঞ্চন কিছুই বাদ যায় না।

সেলিম আল দীনের নাটকে জীবনের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য এক মলাটের মধ্যে ভিড় করে। বিভিন্ন রঙের মানুষ আর তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডে জনপদ যেমন মুখরিত হয়ে থাকে। তেমনি তাঁর রচিত নাটকে উপজীব্য হয়েছে ভালো-মন্দ মিলিয়ে যে মানুষ – তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র । উচ্ছেদের অব্যক্ত যন্ত্রণা ও বিচ্ছেদের শোকের সমন্বয়ে তিনি ১৯৮৫ সালে রচনা করেন *কেরামতমঙ্গল*, যেখানে কেরামত নামের একজন মানুষের ভেতর দিয়ে হাজারো মানুষ ও বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পটভূমিতে কেরামতের জীবনাভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে এই নাটকে; যেন স্বর্গ-নরকের ভেদ ঘুঁচে এক রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটবেলাতেই নিজের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এক মানুষের নাম কেরামত, নাটকে যে এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে ঘুরে ঘুরে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ থেকে শুরু করে '৭১-এ বাংলাদেশের জন্ম পর্যন্ত সে সমগ্র ভূখণ্ডকে নিজের ভেতর গ্রহণ করেছে। মোট এগারোটি খণ্ডে এই নাটকটি বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডেই কেরামত মানবসৃষ্ট এক-একটি দোজখের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে। বাংলাদেশের নাটকে কেরামত অন্যতম প্রধান একটি চরিত্র, কারণ কেরামত এক জীবনে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ ও বিধ্বস্ত হয়েও জয়গান গেয়েছে মানবতার। এত বিস্তৃতভাবে বাংলা নাটকে আর কোনো চরিত্র বিকশিত হয়ে ওঠেনি। পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র নিয়ে বাংলা নাটকের অঙ্গনে তাবৎ পৃথিবীর জন্য শুভকামনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেরামত। কিছু মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থে লাগিয়ে

দেয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এতিম কেরামত হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু। জীবনভর গন্তব্যের দিকে হেঁটে চলা মানুষটি পথে পথে পায় আরো সব ভাঙা মানুষের দেখা, যারা সবাই দোজখের বৃত্তে বন্দী। কেরামত কখনও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে ঘরহারা কৃষক, কখনও হিজড়ার সহানুভূতিশীল সঙ্গী, কখনওবা বোনের অকাল গর্ভপাতের সাক্ষী, সেই আবার হাজংদের বিদ্রোহে ভাগ্যগুণে জড়িয়ে পড়ে বিনা বিচারে বন্দি হয়, সেখান থেকে কেরামত গারোদের দেশে গারোদের বন্ধু হয়ে ওঠে, কখনও সে-ই দায়িত্ব নেয় যুদ্ধের বলী এক বারাঙ্গণার, জীবনের শেষ বৃত্তে এসে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীর পিতা, এই কেরামত আবার পৃথিবীর তাবৎ ভ্রূণের রক্ষক। নারকীয় ভুবনে কেরামত যেন শোষিতের প্রতিভূ। মানুষসৃষ্ট নরকে মহাকাব্যিক পরিধি নিয়ে কেরামতের জীবনযাপন চিত্রিত হয়েছে। সমাজের নানা স্তরের নানা পেশার নানা রঙের মানুষ এই নাটকে উপস্থিত। সেলিম আল দীন বিস্তৃত জীবন উপস্থাপনের জন্য যে বিশাল পরিধির খোঁজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, *কেরামতমঙ্গল* নাটকে যেন তার স্পষ্ট অবয়বদানে সক্ষম হন। *শকুন্তলা* নাটকে খণ্ড বিভাজনের পর কিত্তনখোলা নাটকে সর্গ বিভাজনরীতিতে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন নাট্যকার। তারই উদাহরণ *কেরামতমঙ্গল*। আধুনিক বাংলা নাটকে নতুন ও স্বতন্ত্র এক শিল্পরীতির সন্ধান দেন সেলিম আল দীন। "বিষয়ের গভীরতা বৈচিত্র্য ও বিস্তারে *কেরামতমঙ্গল কিত্তনখোলা* থেকেও মহত্তর উপলব্ধির স্বাক্ষরবাহী [২]। সমালোচক *কেরামতমঙ্গল* নাটকের মধ্যকার বৃত্তাবদ্ধ জীবনচেতনার সঙ্গে তুলনা করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালি*'তে উপস্থাপিত সময় ও কালের বৃত্ত অতিক্রম করে অনন্তের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতাকে [৩]।

প্রস্তুতি পর্বে সেলিম আল দীন *নীল শয়তান : তাহিতি* ইত্যাদি নামে যে নাটকটি রচনা করেছিলেন, সেখানে মি. বুর্হানের আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনে আলোড়ন তোলে জনৈক নাবিকের সমুদ্রজীবনের নানা অভিজ্ঞতার গল্প। বুর্হানের প্রতিষ্ঠিত ও সুখী জীবন ভেসে যেতে থাকে নীল জলরাশির সফেদ ফেনায়। সমুদ্র পাড়ি না দিয়েও এ যেন সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা। সেলিম আল দীনের জীবনের প্রথম অংশ কেটেছে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে। সে কারণে এ সব অঞ্চলে বসবাসরত মানুষদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচিত। চর অঞ্চলের মানুষ হিসেবে নাট্যকার উপলব্ধি করেছিলেন প্রতিটি মানুষের অন্তর্জগতে অন্তর্লীন রয়েছে গভীর এক সমুদ্র। জীবনযাপনের নানা মাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতে বুকের গভীরে লুকায়িত সেই সমুদ্রে ঝড় ওঠে। এছাড়াও প্রতিটি মানুষই জীবনভর নানাভাবে পাড়ি দিয়ে চলেছে গভীর এক-একটি নোনা সমুদ্র।

দৃশ্যমান জগতে যারা সমুদ্রকে জীবনধারণের অন্যতম অবলম্বন বলে মনে করেন, তারা প্রত্যেকে নিজের হৃদয়েও বহন করে চলে আরেকটি গভীর সমুদ্র। তেমনি জীবনবোধ থেকে ১৯৮৭-৮৯ কাল পরিসরে নাট্যকার সেলিম আল দীন রচনা করেন *হাত-হদাই* নাটকটি। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় জনগণের সুখ-দুঃখ-ভরা জীবনযাত্রার গল্প এই নাটকের প্রতিপাদ্য। *হাত-হদাই* একক কাহিনিরীতির নাটক না। অনেক মানুষের অনেক গল্প একটার পর একটা ছবির মতো ভেসে এসেছে। ফেনী-নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় এটি রচিত। তবে নাটক রচনার কৌশলগত কারণে বক্তব্য প্রকাশে ভাষা কোথাও বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেনি।

নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় সমুদ্রের সঙ্গে আজন্ম পরিচিত আনার ভান্ডারি একজন বৃদ্ধ নাবিক। বঙ্গোপসাগর থেকে জাহাজে চাকরির সূত্রে যার অভিজ্ঞতায় যুক্ত হয়েছে–মিশরের বন্দর, ভালোত্তির সেই মেয়েটি, ভূমধ্যসাগরের চাঁদ, ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো বন্দর, থাইল্যাণ্ডের ক্যাসিনোসহ দেশ-বিদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা ঘটনা। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক অনবদ্য জীবনঘনিষ্ঠ চরিত্র এই আনার ভান্ডারি। সে একদিকে মৃত্যুচিন্তা করে, অন্যদিকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চায়। নাটকের উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা মাছ ধরে, বিক্রি করে। কেউ আবার জাহাজের সারেং হয়ে দূর দেশে চলে যায়। নাটকে বর্ণিত পাখি শিকার, ঘুড়ি উড়ানো, মোরগ লড়াই পাঠককে চর অঞ্চলের উৎসবের আমেজ দেয়। নাটকটি পনেরো পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলোর মধ্যে অনেকগুলো উপপর্ব রয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের প্রথমেই জোয়ার-ভাটার উল্লেখ নাটকটিকে অন্যরকম বৈশিষ্ট্য দান করেছে। মোট একুশটি জোয়ার ও উনিশটি ভাটার মধ্যে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। পুরো নাটক জুড়েই আছে জন্ম-মৃত্যু ও জীবন সম্পর্কিত নানা দর্শন। এ অঞ্চলের মানুষের জীবিকার অন্যতম উৎস সমুদ্র। নোনাজলে তাদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য বারবার সিক্ত হয়। বন্দরের কাছাকাছি বসবাস করার কারণে বিভিন্ন দেশের জাহাজ-মানুষ দেখতে দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন বন্দর ও দেশ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। নিজেরাও জাহাজের চাকরি নিয়ে সমুদ্রে ভেসে জীবনবোধের গভীরতার স্বাদ পায়। হাত হদাই নাটকের বিষয় বিশ্লেষণ করলে সমুদ্র ও চর ঘিরে যাপিত জীবন, বাণিজ্য, সমাজব্যবস্থা, মাঝিমাল্লাদের জীবনযুদ্ধের চিত্র পাওয়া যায়। হাত হদাই অর্থাৎ সাত সওদা। জীবনের ব্যাপ্তিতে বিচিত্র সওদাকে নিয়ে আবর্তিত মনুষ্যজীবনকে নাট্যকার উপজীব্য করেছেন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায়। নিত্যদিনকার জীবনযাপনে মানুষ নানা রকমের বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। বৃহৎ জীবন বাণিজ্যে যুক্ত থাকে নানারকমের লেনদেন ও হিসাব-নিকাশ। কতক মেলে কতক কোনদিনও মেলে না। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের তলদেশের গভীর সমুদ্রে বাষ্প ঘন হতে হতে এক সময় ঝড় ওঠে। এই নাটকের আনার, জামাল, চুক্কুনী, আঙ্কুরী, হাস্না, নাড়ু, বেগমী, ছিদ্দা, মালু হাবেজ, ইদ্রিস সবার জীবনেই অন্তর্লীন রয়েছে গভীর এক সমুদ্র। বৃহৎ অর্থে জীবনভর নানা সওদার মধ্যে দিয়েই বিশ্বভূগোলের মানুষেরা পাড়ি দিয়ে চলেছে জীবনসমুদ্র।

১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে সেলিম আল দীন রচনা করেন কথানাট্য ধারার নাটক *চাকা*। *চাকা*–র গল্পটি সাধারণ আটপৌরে গ্রামীণ জীবনের। তৃতীয় তরঙ্গে জানা যায় হলুদ পলেস্তরা খশা এলংজানি হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার অপঘাতে নিহত

হোসেনালী নামের এক যুবকের লাশ এসেছে। তাকে পৌঁছে দিতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। বৈশাখের এক সকালে লাশ ও একটি ঠিকানা নিয়ে গাড়োয়ান ও দুজন সহযোগীর সঙ্গে ডোম ধরমরাজ কাকেশ্বরী গাঙের পাড়ের গঞ্জ এলংজানি থেকে যাত্রা শুরু করে। পথে-পথে নানা অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় নবীনপুর গাঁয়ের এক নদীর তীরে এসে পৌঁছায় তারা। আর সেই নদীর তীরে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের লাশটি শাস্ত্রমতে দাফন করে।

মৃত্যু ও মৃতের প্রতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের যে সাধারণ একটা ভাবনা আছে সেটাকে খুঁজে বের করার একটা প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা *চাকা* নাটকে স্পষ্ট। নাট্য কাহিনিতে যা বর্ণিত হয়েছে, সেটা বাস্তবেরই অনুরূপ, যে প্রতিটি মানুষই নিজের সুবিধাটুকু নিয়ে ব্যস্ত। চারপাশের সবকিছুতেই নিস্পৃহতা। নিজের কর্তব্যটুকু মানুষ দায়িত্ব নিয়ে পালন করলে মানবিক অপচয় বন্ধ হয়। *চাকা* নাটকে ছোটো পরিসরে মৃত্যু নিয়ে যে বোধকে তিনি তুলে ধরেছেন, বিশ্ব-ভূগোলের প্রেক্ষাপটে তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে *নিমজ্জন* নাটকে। নব্বই দশকের গণ-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল লাখো বাংলাদেশী। তাদের মধ্যে অনেকে শহিদ হয়েছিলেন, কিন্তু সবার নাম-ঠিকানা জানা যায়নি। অন্যায়ভাবে মৃত অনামা ব্যক্তিগণ সমাজে নানাভাবে অবহেলার শিকার হয়। সেলিম আল দীন অবশ্য নিজেই বলেছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি চাকা নাটকটি রচনা করেননি, তবে নাটকটির যে একটি 'নিজস্ব ও নৈসর্গিক অর্থ আছে [৪] তা তিনি *চাকা* কথানাট্যের কথাপুচ্ছে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ছাড়াও বিষয় উপস্থাপনের গুণে নাটকটিতে মৃত মানুষের গুরুত্বহীনতা, লাশের ঠিকানা পেতে ব্যর্থতা ও মানবিক চেতনা *চাকা* নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। এই নাটকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভেসে চলে যে ব্যক্তির লাশ, সেও এক দিন পৃথিবীতে দৃপ্ত পা ফেলে হেঁটে চলত, আনন্দ-বেদনায় কম্পিত হতো তারও অন্তর। মৃত্যুর পর নিজের লাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না মানুষের। তাই জীবিতের অবহেলার বা বিভিন্নজনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কোনো প্রত্যুত্তর সে দিতে পারে না। আর ঠিক এখানেই মনুষ্যত্বপূর্ণ সব মানুষের মতো মানবিকতায় আর্দ্র হয়ে ওঠে সেলিম আল দীনের মন। এ বিষয়ে সেলিম আল দীনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য – "এবং লেখার পর আমারও মনে হয়েছে সমকালের বেদনা এ রচনায় বহুদূরে নানা বাঁক ঘুরে ভিন্ন শিল্প ভাষায় এসেছে। ধরা যাক আমি বাস্তবেই একটি গল্প বলতে চেয়েছি – সে গল্পের শববাহী চাকার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছি মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে। এ কাহিনীর ক্ষেতমজুরদের হাতে কবর খনন হলে অনামা মৃতের গতি হল। কেউ যে চিনতে পারল না তার কষ্ট নিবারিত হল জানাযা ও কবরের পরে। সে আনন্দ ও শোকের যদি কোন মানবিক তাৎপর্য থাকে তবে তাতেই আমি খুশি হব [৫]"। আধুনিক মানুষের মানবতাবর্জিত গন্তব্যহীনতার স্পষ্টরেখাচিত্র যেন কথানাট্য *চাকা*।

১৯৯৩ সালে সেলিম আল দীন রচনা করেন তাঁর কথানাট্যধারার পরবর্তী নাটক *যৈবতী কন্যার মন*। এক নারী দুই সময়কালে পৃথিবীতে আসে। নিজেদের জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তুলে ধরে যুগযন্ত্রণার নির্মম চিত্র। দুই জন্মেই 'যৌবনের উপান্তে [৬] নিজেই নিজেকে খুন করে দুই নারী। তাদের একজন কালিন্দী। মধ্যযুগে রচিত গীতিকা পালার নারীদের অনুসরণে সৃষ্ট এই চরিত্রটি–দেবদ্রোহী। এই নাটকের গল্পে কালিন্দী আত্মহত্যার পর সারিবদ্ধ দেবদূতের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করে–"দেবদূত আমার আবার জন্মান্তর হলে শুধরে নেব ভুল [৭]। দেবদূতের প্রার্থনায় ঈশ্বরের আনুকূল্যে সে আবারো মাতৃজঠর থেকে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। আধুনিককালে–দ্বিতীয় জন্মে তার নাম হয় 'পরী'। সেলিম আল দীন নাটকের শুরুতে এভাবেই বর্ণনা করেছেন দুই নারীর মৃত্যু ও জন্ম রহস্য। *যৈবতী কন্যার মন* বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিষয়ভাবনার গুরুত্বের কারণে বিশেষ স্থানের দাবিদার। বাঙালি নারীর শাশ্বতরূপ আত্মনিয়ন্ত্রিত, ত্যাগী, সংযমী, সংসারজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চুপ। নীরবতা ও সহ্যক্ষমতা এদেশের নারীদের প্রধান সৌন্দর্য। এ অঞ্চলের নারীরা সাধারণত রুখে দাঁড়ায় না। আর দাঁড়ালেও তা বাহবা লাভ করতে পারে না। কালিন্দী ও পরী দুজনই স্পষ্টতই ব্যতিক্রম। এরা এদের ভালোলাগা-ভালোবাসার কথা অকপটে স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। সমাজ মেনে নেবে না, কুলটা বোনের জন্য বিবাহিত অন্য বোনদের গঞ্জনা সহ্য করতে হবে, বাবা-মা প্রচণ্ড আঘাত পাবে জেনেও কালিন্দীর কাছে প্রেমধর্ম বড় হয়ে উঠেছিল। আলালকে যে সম্মান সে দিয়েছিল, তার মূল্য আলাল তাকে দিতে পারেনি। ভালোবাসাকে সম্মান করতে পারার কৃতিত্ব কালিন্দীর একার দখলে। কোনোকিছুর বিনিময়ে সে আপোষ করতে রাজি নয়। এই আত্মমর্যাদাবোধ কালিন্দীকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। অন্যদিকে পরী–শিল্পী। সব বাঙালি নারীর মতো একটা সংসারের স্বপ্ন লালন করে কৈশোরোত্তীর্ণ পরী প্রথম ধাক্কা পায় অনিন্দ্যর কাছ থেকে। শিল্পের মধ্যে দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সে, কিন্তু মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকারে। সেখান থেকে পরী আর নিজেকে উঠিয়ে আনতে পারে না। বিষ পান করে নিজের জীবনকে দুই নারীই সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়।

নারী যুগে–যুগেই নিগৃহীত। স্বামী-সন্তান-সংসারের দায়বদ্ধতায় ঢাকা পড়ে যায় নারীর নিজস্ব সত্তা; শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত করে চলে তাকে। বহন করতে হয় ধর্ষিত হবার, ভ্রূণ খসে যাবার, প্রেমহীন জীবনযাপনের মর্মান্তিক কষ্ট। সেলিম আল দীনের নাটকে বারবারই নারীজীবনের নানা বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে। কালিন্দী ঘর ছাড়ে যে আলালের জন্য, সেই আলালই তাকে অবলীলায় ছেড়ে যায়। ঘাটে–ঘাটে ভেসে চলা কালিন্দী ক্রমাগত হাত বদল হয়, ধর্ষিত হয়। *কিত্তনখোলা* নাটকে বনশ্রী, *কেরামতমঙ্গল*-এ নওশাদী ও নুরজাহান, *হাত হদাই*-তে চুক্কুনী, *বনপাংশুল*-এ সুকী নামের চরিত্রগুলোকে ঠিক একইভাবে শারীরিকভাবে

লাঞ্ছিত হতে দেখা যায়। নারীর জন্য সম্মান ও মমতা স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মধ্যে জাগ্রত হয় না। তাই তো সেলিম আল দীনের নাটকে নারীর জন্য ভালোবাসার পাশাপাশি ভ্রূণের নিরাপত্তা বড় দাবি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মকাল। মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার সর্বউত্তরের 'হরগজ' নামের গ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এক প্রবল টর্নেডো, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে পুরো গ্রাম, আর প্রাণহানী ঘটে বিস্তর। *হরগজ* নাটকটি সেই টর্নেডোর বিপর্যস্ত জনপদের অসাধারণ চিত্রকল্প। নাটকের শেষে নাট্যকার–প্রদত্ত তারিখ হিসাবে তিনি ১৯৯২ সালের ত্রিশে জানুয়ারি *হরগজ* রচনা শেষ করেন। *হরগজ* নাটকের কথাপুচ্ছ অংশে নাট্যকার প্রলয়ংকরী ঝড়ে সৃষ্ট ধ্বংসলীলার মর্মান্তিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন : "সে টর্নেডোর ফলে তদঞ্চলে এক সমৃদ্ধ কৃষিজীবী জনপদের প্রায় সামগ্রিক বিনষ্টি ঘটে। উড়ন্ত ঘরের চাল টিন বৃক্ষ ছিন্ন শাখা মৃতপাখি – পশ্বাদি সহস্র হত আহত মানবের দেহ ও খণ্ডাংশ প্রভৃতি প্রাক্কালিত স্বাক্ষরে পরিপূর্ণ ছিল টর্নেডো–উত্তর সে স্থলের সমগ্র প্রান্তর [৮]।

টর্নেডো-পরবর্তী সময়ে হরগজ ঘুরতে গিয়ে চেনাজানা জগতের সঙ্গে মিল খুঁজে পাননি নাট্যকার। সেখানে তিনি আবিষ্কার করেন এক 'নিরাকার বিশ্ব' [৯]। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকার সন্তান হিসেবে তিনি ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস দেখেছেন আশৈশব। তারপরও নাট্যকারের পূর্বকার সব অভিজ্ঞতাকে হার মানিয়ে দিয়েছে হরগজের প্রলয়, জীবনভাবনার গভীরতর তলদেশে তোলপাড় হতে থাকা ভয়াবহসব দৃশ্য, যেখানে মানুষের মৃত্যুই শেষ কথা নয়। একটা লাশও পূর্ণাঙ্গ নয়। ছিন্নভিন্ন শরীরের ছড়াছড়ি চারিদিকে। লেখক কল্পনা করেছেন ঝড়-পরবর্তী সময়ে প্রথম ত্রাণবাহী দলের সঙ্গে তিনিও ছিলেন। সেই ভাবনা থেকেই তিনি গল্পের পুরো শরীরে অস্থিমজ্জা সংযোজন করেছেন, যা ভীষণরকমের জীবন্ত। নাট্যকার *হরগজ* নাটকে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে জীবন ও মৃত্যু মানবজীবনের নিকটতম প্রতিবেশী। কবরখননের লোক খুঁজতে গিয়ে গৃহস্থ বাড়ি মনে করে উঁচুস্থানে উঠে ত্রাণকর্মী আবিদ বুঝতে পারে সে কবরের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে, যেন মৃতের পাঁজরের হাড় তাদের পায়ের আঘাতে মুড়মুড় করে ভেঙে যায়। বিধ্বস্ত জনপদে ইতস্তত পড়ে আছে লাল শাড়ি, কনুই থেকে কাটা হাতে চুড়ি, হাতের মুঠোয় ধান। জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাশাপাশি পড়ে আছে খণ্ডিত মানুষ। জীবন-মৃত্যুর সমন্বয়রেখা *হরগজ*। বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠার লড়াই, হানাহানি, দখলের রাজনীতি, চক্রান্ত, সামাজিক অস্থিরতার বিপরীতে *হরগজ*-এর ধ্বংসের চিত্র অঙ্কন যেন নাট্যকারের ইচ্ছাকৃত, যেন বা তিনি মনে করিয়ে দিতে চান জীবনের নশ্বরতার কথা। *চাকা, হরগজ, নিমজ্জন* যেন একই সূত্রে গাঁথা।

সেলিম আল দীনের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয় ও আঙ্গিকের নিত্য নতুন নিরীক্ষা। *কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, চাকা, হাত হদাই, যৈবতী কন্যার মন* নাটকে বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির সফল প্রয়োগের পর তিনি মধ্যযুগের পাঁচালির আঙ্গিকে রচনা করলেন *বনপাংশুল*। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ কালপরিসরে তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। বাঙালিদের আগ্রাসনে দিন–দিন আদিবাসীরা হারিয়ে ফেলছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। ক্ষয়িষ্ণু নৃগোষ্ঠীর অনাড়ম্বর অথচ কৃত্যমূলক জীবন যাপন, চলমান সংকট, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ বিরোধ, সমকালীন জীবনস্রোতে পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা *বনপাংশুল*। মান্দাই নৃগোষ্ঠী শিবের চুকুনি সুকীর হাতে তৈরি দরা খায়, রাতভর নৃত্যগীতে মত্ত থাকে। বনভূমি থেকে নানা কৌশলে এদের উচ্ছেদ করে সেই জমি দখল করে চলেছে বাঙালিরা। আর একাজে উৎকোচের বিনিময়ে সাহায্য করে সরকারের আইনরক্ষকেরা। আর এভাবেই দেশান্তরিত হওয়ার পাশপাশি ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনাও মান্দাই সমাজে স্বাভাবিক। লুৎফর মাস্টার লুপ্তপ্রায় এই অসহায় মান্দাইদের ভালোমন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। বনপাংশুলদের প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র তার মন। ফরেস্টারও মাস্টারের প্রভাবে কিছুটা মানবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো কিছুতেই বাঙালি মহাজনদের বনভূমি দখল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। গুণীনের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব নিয়ে মান্দাইদের মধ্যে বিভক্তি ও সংঘর্ষ শুরু হয়। গোষ্ঠীবিরোধের সুযোগে বাঙালিরা আক্রমণ চালায় মান্দাইদের ওপর। হত্যা, ধর্ষণের মহোৎসবে প্রাণ ও সম্ভ্রম হারায় লুপ্তপ্রায় বনপাংশুলগণ। আগুনের লেলিহান শিখায় লাল হয়ে ওঠে চোরাইকারবারীদের হাতে–হাতে ফাঁকা হয়ে যাওয়া বনভূমির মাথা। ধর্ষিত সুকী শিবের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফরেস্টার অনিলকে বনের এক প্রান্তে অল্প জমি দিয়ে যায়। সুকীকে নতুন বসনে জড়িয়ে বনের প্রান্তভাগে অনিল নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সুকির সঙ্গে যায় মান্দাইদের ঘৃণার ফসল, গর্বের ভ্রূণ। বাঙালি-মান্দাই শঙ্করমানবের জন্য উপযুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে থাকে সুকি-অনীল। অন্যদিকে ফরেস্টার বদলি হয়ে সুন্দরবনে চলে যায়। সেখানেও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর পরিণতি একই।

সেলিম আল দীনের অনেক নাটকেই ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ ক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে। *কেরামতমঙ্গল*-এ হাজং ও গারো সম্প্রদায়, *চাকা* নাটকে সাঁওতাল, *যৈবতী কন্যার মন* নাটকে রাখাইন সম্প্রদায়ের উপস্থিতি যোগ করেছে নতুন মাত্রা। *বনপাংশুল* নাটকে তিনি একটি জাতির ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এসকল নৃগোষ্ঠী যত ক্ষুদ্রই হোক, ভৌগোলিকভাবে এরা এদেশের মাটি, জল, বায়ুর সমান অংশীদার। এদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এদেশের অহংকার। নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতাপূর্ণ অবস্থান স্বদেশীয় গৌরব। বাংলাদেশের জনজীবনের সংগ্রাম, শোষণ, জীবনযুদ্ধ চিত্রিত করতে গিয়ে নাট্যকার বারবারই ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর উচ্ছেদ ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, যা তাঁর বিষয়ভাবনাকে আরো স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

নাট্যকার সেলিম আল দীনের হাতে ১৯৯০-৯১ সালে তৈরি হয় 'নিও এথনিক থিয়েটার' – *একটি মারমা রূপকথা*। মারমা নৃগোষ্ঠীর একটি কাহিনি অবলম্বনে তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। স্বর্গরাজার মেয়ে মনরি পৃথিবীতে এলে সাথানুর সঙ্গে প্রেম-বিয়ে

হয়। জন্ম নেয় এক সন্তান। তারপর মনরি স্বর্গে ফিরে যায়। সাথানু নানা বাধা-বিপত্তি জয় করে স্বর্গে পৌঁছায় এবং মনরিকে নিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটাই নাটকের কাহিনি। মূলত নাট্যকার নৃগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙালিদের উৎসাহ তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাহিনি হলেও এটি এথনিক থিয়েটার নয়, বরং শিল্প–পরিভাষা হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে 'নিও এথনিক থিয়েটার'। গবেষণাগারে দীর্ঘ গবেষণাজাত ফসল বলে এই গবেষণাগার নাট্যে আধুনিক থিয়েটারের কলাকৌশল অনুসৃত হয়েছে।

২০০০ সালে সেলিম আল দীন রচনা করেন *প্রাচ্য*। নোলক ও সয়ফরের কাহিনি নিয়ে রচিত এ নাটকে জীবের প্রতি প্রেমের যে ঐতিহ্যবাহী ভাবনা প্রাচ্যে প্রচলিত, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান এদেশীয় রীতি। *চাকা*, *বনপাংশুল*, *পুত্র*, *স্বর্ণবোয়াল*, *ধাবমান* প্রভৃতি নাটকেও প্রকৃতি মিশে গিয়েছে মানুষের সঙ্গে। একে অন্যকে ছাড়া পূর্ণতা পেতে পারে না। সয়ফর বিয়ে করে আনে নোলক নামের মেয়েটিকে। বাসররাতে ইঁদুরের গর্তে পা পড়লে নোলককে সাপে কাটে। সেই সাপটিকে হত্যা করতে উদ্যত হয় সয়ফর। একসময় সে নোলকের হত্যাকারী সাপটির মুখোমুখি হয়। দাদীর অনুরোধে সাপটিকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে পারে না সয়ফর। নোলকের নতুন কবরের উপর দিয়ে সাপটি চলে যায় গভীর বনে। নোলকের মৃত্যু নাটকের অন্যতম প্রধান বিষয় হলেও বিষয়ের অতিরিক্ত আরো গূঢ় অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে প্রাচ্যের শরীরে। প্রকৃতির ভেতর মানুষ ও প্রাণি জগত পাশাপাশি অবস্থান করবে এটাই স্বাভাবিক। এর অন্যথা হলে ভঙ্গ হয় প্রকৃতির নিয়ম। জীবপ্রেমের সঙ্গে ক্ষমাও প্রাচ্যদেশীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সেলিম আল দীন সৃষ্ট 'বিপরীত পুরাণ' [১০] এ নোলকের পা পড়ে সাপের আস্তানায়। তাই সে দংশন করে, সাপের বিচরণভূমিতে প্রবেশ না করলে হয়ত কাহিনি অন্যরকম হতো। যার যার অবস্থানে সে সে থাকবে, এটা প্রকৃতির নিয়ম – এই বক্তব্যটিকেই যেন নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নাট্যচর্চার এই পর্যায়ে সেলিম আল দীন বিষয়গত দিক থেকে আরো বিস্তৃতির দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এ পর্যন্ত রচিত নাটকগুলোতে বাংলাদেশের সমাজকাঠামোতে জীবনের ব্যাপক বিস্তৃতি তিনি মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় সৃজন করেছেন, কিন্তু ২০০২ সালে রচিত *নিমজ্জন* নাটকে দেখা যায় বিশ্বভূগোলকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করতে। প্রথাগত কোনো একমুখি কাহিনি এ নাটকে অনুপস্থিত। শুধু একটি দেশ এ নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় না। সমগ্র বিশ্ব এ নাটকের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সভ্যতার নির্মম, নিষ্ঠুর ও অমানবিক দিকগুলোর খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকল্প *নিমজ্জন*। ধর্মের নামে, সামাজিকতার নামে, শান্তির নামে, রাজনীতির নামে, ক্ষমতার নামে প্রতিনিয়ত বিশ্বে ঘটে চলেছে নৃশংসতার মিছিল। *নিমজ্জন* নাটকে সেগুলোকেই একসূত্রে বেঁধেছেন তিনি।

আধুনিক সমাজে মানুষমাত্রই আত্মতৎপর ও স্বার্থসচেতন। *চাকা* নাটকে সেলিম আল দীন যে মানবতাকে ফেরি করেছেন, তা যেন আরো বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে *নিমজ্জন* নাটকে। এই নাটকটিতে একবিংশ শতকের বিশ্বভূগোল উপস্থিত হয়েছে। প্রথাগত কোনো গল্প এখানে পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট কোনো জনপদের নয়, বরং পুরো বিশ্বের গণহত্যা, খুন, ধর্ষণসহ নির্মমতার চিত্র এ নাটকটি। ঘটনার ডকুমেন্টেশনই এখানে মুখ্য। *নিমজ্জন* নাটকে তাই শহর বা চরিত্রগুলোর কোনো আলাদা নাম নেই। সাহিত্যের অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা, বালিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী, আগন্তুক, শিষ্য ছাত্র, মহিলা কবি, মহিলা সাংবাদিক, সুদর্শন যুবক প্রভৃতি পরিচয়ে চরিত্রগুলোর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নাট্যকার নিমজ্জনকে বলেছেন 'বিশ্ব শিল্পধারায় ফোররিয়ালিজমের প্রথম উদ্ভাবন' [১১]। বিষয়প্রধান এ নাটকে সভ্যতার সংকট ও মানবিকতার বিপর্যয় প্রাধান্য পেয়েছে। এর প্রতিটি পর্বেই অস্বাভাবিক মৃত্যু, ধর্ষণ, গণহত্যা, লুণ্ঠনের চিত্র জ্বলজ্বলে। বিশ্বজুড়েই চলছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক গোপন অথচ ভয়ংকর খেলা। আর তার শিকার হচ্ছে মানুষ। ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হিসেবে মানুষই মানুষের বিপক্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে। আগন্তুক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে এমনই এক শহরে এসে উপস্থিত হয়, যেখানে হত্যা পানির দরে বিক্রি হয়। ত্রিশ–একত্রিশ বছর পরে দুই বন্ধুর দেখা হয়। এতদিন রেডক্রসের কর্মী হিসেবে আগন্তুক বন্ধুটি ভ্রমণ করেছে বিশ্বের নানা দেশ। ভ্রমণকালে বিশ্বব্যাপী গণহত্যার অভিজ্ঞতায় বেদনার্ত হৃদয়ে যৌবনে দেখা হওয়া বন্ধুকে দেখতে এসে সে আরো বীভৎস ঘটনার মুখোমুখি হয়। আগন্তুকের বন্ধুটির সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের রাজনৈতিক মতভেদ হয়, যার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই অধ্যাপককে রিমান্ডে সব ধরনের অত্যাচার শেষে তার মেরুদণ্ডে পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া হয়। স্ত্রীকেও একুশটি ছুরির আঘাতে হত্যা করা হয়। শেষ পর্যন্ত মারা যায় একমাত্র পুত্র। পরিশেষে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে আগন্তুক ক্রমশ নিমজ্জমান শহর থেকে পালাতে সক্ষম হয়। তাঁর সঙ্গে বন্ধুর লিখিত গ্রন্থ। আর সাহিত্যের অধ্যাপকের বালিকাকে আটজন মিলে ধর্ষণ শেষে যে বালিকার জিহ্বা শোষকেরা কেটে দিয়েছিল। আর বন্ধুর শিষ্য ছাত্রটি। তিনজন শহরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে নতুন কোনো ভেদাভেদহীন রাষ্ট্রের। নাট্যকার নাটকের শেষে আশা করেছেন নতুন পৃথিবীর। যেখানে হত্যা, ধর্ষণ, জখম, শোষণ সব লুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষ চাঁদ চাষ করবে নতুন ভাবনাভূমিতে। বিভিন্ন শিরোনামের ঘটনাগুলো নাট্যকার গল্পকথনের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। সংলাপ ও বর্ণনার অদ্বৈত অবস্থান নাটকটিকে দ্বৈতদ্বৈতাবাদী শিল্পদর্শনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ করে তুলেছে। এ নাটকের গদ্যের কাব্যময়তা সংগীতের সমপর্যায়ে উন্নীত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে যে গণহত্যা, নির্যাতন চলছে, সেগুলোর প্রতি শিল্পিত ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে *নিমজ্জন* নাটকে।

২০০৭ সালে সেলিম আল দীন রচনা করেন আখ্যানধর্মী নাটক *ধাবমান*। এর মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে একটি ষাঁড়, যার নাম সোহরাব। নাট্যকার ক্ষিপ্র ষাঁড়টির মধ্যে প্রযুক্ত করেছেন মানবিক চেতনা। দুর্দান্ত ষাঁড় সোহরাব লড়াইয়ে জিতে সোনার মেডেল নিয়ে আসে। সুবতী ও নহবতের সন্তান এসাক। তার ডান পা সচল থাকলেও বাম পা অচল। এসাক স্বপ্ন দেখে : "সোহরাবকে জবাই করলে তার মাংসে গেরামবাসীকে ভোজ দিলে তবেই তার আরেকটা পা ভালো হয়ে যাবে [১২]। হত্যাকারীদের তাড়ার মুখে সোহরাব সবকিছু তছনছ করে পালিয়ে বেড়ায়। ধাবিত হয় গ্রামের পর গ্রাম, মেলা, জনপদ। শেষে এক ভোরে নিজের ঘরের উঠোনে ফিরে এসে মানব পিতামাতার সামনে স্বেচ্ছামৃত্যু মেনে নেয়। গল্পকথনের রীতিতে রচিত এই *ধাবমান* নাটকটি মূলত একটা বোবা প্রাণীর গল্প, যা মানুষের নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে ক্রমশ ধাবমান।

হারজিতের উর্ধ্বে অনন্য এক দার্শনিক জীবনবোধসম্পন্ন নাটক *স্বর্ণবোয়াল* (২০০৭)। সেলিম আল দীন আঙ্গিকগত দিক থেকে নিরন্তর সন্ধান করেছেন নতুন নতুন মার্গ। তাঁর অন্তর্গত ধারণার মধ্যে খেলা করত এমন শিল্পধারা, যেখানে সৃজিত হবে শিল্পের অভেদভুবন, গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-চিত্র সব একে অন্যের মধ্যে লীন হয়ে যাবে। সৃজিত হবে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প। *স্বর্ণবোয়াল* সেই বোধ থেকেই উৎসারিত। বাংলা সাহিত্যে মাছকে কেন্দ্র করে উপাখ্যান রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম সংযোজন *স্বর্ণবোয়াল*। আঙ্গিক বিবেচনা করলে উপাখ্যানবর্তী *স্বর্ণবোয়াল* নাটকের মধ্যে চিত্রকলা, কবিতা, নাটক উপন্যাসের গন্ধ স্পষ্ট। চকচকে সোনারঙা এক *স্বর্ণবোয়াল*-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নাটকটি। চিরলি গাঙে বসবাস করে সেই অজেয় অথচ আরাধ্য মাছটি। নিকারিপাড়ার লিক্কত মাঝি সবার কাছে স্বর্ণবোয়ালের গল্প করেছিল। সেই থেকে সবাই স্বপ্ন দেখে স্বর্ণবোয়াল শিকারের। কত জীবন যে সেই মাছের পেছনে ছুটতে ছুটতে শেষ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তিরমনের পূর্বের দুই পুরুষ স্বপ্ন নিয়ে নদীর বুকে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর থেকে স্বর্ণবোয়ালের নেশা তিরমনের বুকে বাসা বাঁধে। এক ঝড়–বৃষ্টির রাতে তাই তিত কামারের তৈরি বড়শি হাতে তিরমন নদীর তীরে উপস্থিত হয়। স্বপ্নের মাছ শিকারিদের সঙ্গে তিরমনও বড়শি ফেলে। সে বড়শিতে স্বর্ণবোয়াল পানির তলদেশ আলো করে ধরাও দেয়। পানির নিচে বেশ অনেকক্ষণ চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তিরমন মাছটিকে কূলে উঠালেও হাট বা নিলামে নেওয়া হয় না। তার আগেই মাছটি নদীতে ঝাঁপ দেয়। লড়াইয়ে কার তবে জিত হলো। তিরমন ঠিকই তো শিকার করেছে, আবার মাছটিও স্থলে থাকল না, নিজের আবাস সেই নদীর জলে চলে গেল। নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন যে প্রকৃতিতে হার-জিত বলে কিছু নেই। লড়াইটাই সত্যি। বাকি সব সমানে সমান। মাছ শিকারের মধ্যে দিয়ে পুরো নিকারি জগতটা মুখরিত হয়ে উঠেছে *স্বর্ণবোয়াল* নাটকে। সমাজের পিছিয়ে পড়া এ সব মানুষের কথা সাহিত্যে সচরাচর গুরুত্ব পায় না। ব্যতিক্রম সেলিম আর দীন। তিনি প্রয়োজনীয় অথচ অবহেলিত মানুষগুলোর পরিশ্রমক্লান্ত জীবনের অনন্য রূপকার।

সেলিম আল দীনের ২০০৭ সালে রচিত আরো একটি আখ্যান *পুত্র*। একমাত্র পুত্র মানিককে হারিয়ে শূন্য বাড়িতে আহাজারি আর সন্তানের জীবনকালের স্মৃতি হাতড়ে চলার গল্প *পুত্র*। লেখাপড়া শিখিয়ে সন্তানকে বড় মানুষ করে তুলতে চায় তারা। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় আবছা-সিরাজ দম্পতি সন্তানের সব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। অভিমানে মানিক বেতবনের মধু আম গাছে নাইলনের দড়িতে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করা গাছ রাখতে নেই-এই প্রবাদে মৃত্যুর পনেরো দিনের মাথায় মুকুলের ভারে নুয়ে পড়া আমগাছটি কেটে ফেলা হয়। আবছা আবারও মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চায়। মাইট্যাল সিরাজের সঙ্গে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হলে আবছা নিজের দেশ যমুনার কূলের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়ে। বাড়ি ছাড়ার পথে মানিকের কবরের দিকে তাকিয়ে সে প্রার্থনা জানায় ও যেন আবারও তার কোল জুড়ে আসে। আখ্যানধর্মী এ রচনাটিও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শনের অনুবর্তী। আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনে সংসারের নিত্য দিনকার দুঃখ-সুখের পাশাপাশি পিতৃ-মাতৃহৃদয়ের হাহাকার *পুত্র* নাটকের উপজীব্য।

সাহিত্যিক সবসময় যুগযন্ত্রণা বহন করে। সাধারণ মানুষের বোধের অতিরিক্ত অনুভব ও তার সময়োপযোগী প্রকাশ সাহিত্যকে অনন্যতা দান করে। বাংলা নাটককে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের বক্তব্যপ্রকাশের দেশজ হাতিয়ার করে তুলেছিলেন সেলিম আল দীন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিসহ তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। সুসজ্জিত নাগরিকজীবনে নেতার মৃত্যু, সাপের উপদ্রব বেড়ে যাওয়া, অথবা শহরে জন্ডিস রোগী বৃদ্ধি, হাসপাতালের স্থানে বেলুনের কারখানা স্থাপন, পদস্থ কর্মকর্তা বুর্হানের শহুরে যান্ত্রিকতা ছেড়ে সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার অভিলাষ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে বেড়ে ওঠা সমাজপতির পাশাপাশি সুন্দরবনের নিরন্ন বাওয়ালি সম্প্রদায়ের অবর্ণণীয় জীবনসংগ্রাম, স্বোৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া আতর আলী বা ঝিনাই নদীরধারের বিশু কুমোরদের মাটির জিনিসপত্র বানানো বাদ দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানায় যোগ দেওয়ার দৃশ্যপট থেকে গ্রামীণ জনজীবনের আদ্যোপান্ত একে-একে উন্মোচিত হয়েছে সেলিম আল দীনের লেখনীতে। সেলিম আল দীনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আলোড়ন তুলেছিল ব্রাত্যজনের জীবনসংগ্রাম। তাইতো কেরামতের মতো উচ্চ মানবিকবোধসম্পন্ন চরিত্র বাংলা নাটকে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। আবার কালিন্দী বা স্বভাবজাত শিল্পী বনশ্রী, পরীও তারই সৃজিত আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় চরিত্র। বাংলা নাটকে আনার ভাণ্ডারির মত জীবনঘনিষ্ঠ চরিত্র খুব একটা দেখা যায় না, যে কিনা জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও বেঁচে থাকাকে আনন্দময় করে তুলতে পারে। যে মৃত্যুকে

স্মরণ করার নিমিত্তে নিজের জন্য কবর খুঁড়ে, আবার জীবনকে ভালোবেসে সে কবর নিজেই বন্ধ করে দেয়। ভূমিহীন দিনমজুর সয়ফর শেষ জমি বন্ধক দিয়ে বিয়ে করে আনে নোলককে, বাসর ঘরে সাপের কামড়ে সেই বউয়ের মৃত্যু যে শুন্যতার হাহাকার সয়ফরের হৃদয়ে আঘাত করে, সে বেদনা বাংলা নাটকে বহন করে এনেছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ আগন্তুক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক যে রাষ্ট্রভাবনামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন – বাংলা নাটকে অনন্য চরিত্র হিসেবে তারা সংযোজিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পে গরু নিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', মহিশ নিয়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়' এবং হাতি নিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিনী'র মতো গল্প লেখা হলেও নাটকের অভ্যন্তরে ব্যাপক – বিস্তৃত জীবন ও পারিপার্শ্বের বস্তুজগত গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন। সাপ, মাছ, ষাঁড়কে যুক্ত করে সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের বিষয়স্বরূপের পরিধিতে বৈচিত্র্যের অনন্যতা যুক্ত করেছেন। এদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে এদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্রজাতিসমূহের ভাঙা মানুষদের কথা। বাংলার ধূলো-কাদা-মাখা পথে হেঁটেহেঁটে খুব কাছ থেকে যাদের তিনি দেখেছেন, নাট্যরচনার সময় সেই মানুষগুলোকেই তিনি তাদের সমাজ-জীবনসহ নাটকে সম্পৃক্ত করেছেন।

সেলিম আল দীনের সৃষ্টিসমগ্র বাংলা নাটকে যোগ করেছে বিস্তৃত পরিসর। বাংলাদেশের ঋতুভেদে প্রকৃতির নানা রূপ, গ্রামীণ ধুলোমাখা আঁকা-বাঁকা পথ, আকাশে পাখির অথবা মৌমাছির ঝাঁক, নানা নামের মাছ, গভীর অরণ্য, পাহাড়, দিগন্তজোড়া শষ্যভূমি, নদী, সাপ, মহিষ, মাছ, মুকুলভরা মধু আম গাছ এবং সর্বোপরি গ্রামবাংলার জনপদ তাঁর নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। শোষিতের নগ্নরূপ তিনি স্পষ্টভাবে নাটকে চিত্রিত করেছেন। তাঁর নাটকগুলোতে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে স্বাধীনতার চেতনা, আর্থ-সামাজিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক জীবনবোধ সর্বোপরি মানবিক চেতনা। বাংলা নাটকের বিষয়ভাবনায় মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায়। তাইতো মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতি ও প্রাণিকূল তার রূপ-রসের মাধুর্যে সরব হয়ে ওঠেছে। বলা যায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিষয় ও শৈলীর প্রাতিস্বিকতায় সেলিম আল দীন যুক্ত করেছেন স্বকীয় স্বর।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. লুৎফর রহমান, ব্রতচারী শিল্পী, সেলিম রেজা সেন্টু সম্পাদিত দুই বাংলার থিয়েটার ৪, ০২ বর্ষ, ০২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৯৪
২. লুৎফর রহমান, কালের কথক, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৩১
৩. লুৎফর রহমান, কালের কথক, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৩৪
৪. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৪, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. কথাপুচ্ছ ১৬২
৫. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৪, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. কথাপুচ্ছ ১৬২
৬. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৪, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৬৬
৭. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৪, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৬৭
৮. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৪, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. হরগজ কথাপুচ্ছ ৩১১
৯. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৪, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. হরগজ কথাপুচ্ছ ৩১২
১০. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৬, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬১
১১. সেলিম আল দীন, নিমজ্জন, ক্রান্তিক, ২০০৪, গ্রন্থের ফ্ল্যাপ
১২. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৭, মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৩৭